চাট্‌নী।

(মজার হাসি ও রঙ্গরসের ফোয়ারা)

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহিত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এস্‌সি.

ও

শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী, বি. এ.

৬১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩১৯

মূল্য ।০ আনা।

Printed by K. C. Neogi,
at the Saraswaty Press,
26, Amherst Street, Calcutta

Published by Jatindra Kishore Chowdhury, B. A
61, Mechuabazar Street, Calcutta

উৎসর্গ

যাঁহার লেখনী

নাট্য সাহিত্যে ও রস সাহিত্যে

যুগান্তর আনিয়াছে

যিনি স্বীয় প্রতিভায়

বঙ্গ-সাহিত্যকে প্রভা-মণ্ডিত

করিয়াছেন

সেই

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন

পরম ভক্তি-ভাজন

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের

কর-কমলে

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা

ভক্তিভরে

অর্পিত হইল।

নিবেদন।

চাট্‌নি বাজারে বাহির হইল। বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকগণ যে ইহার পূর্ব্বে চাট্‌নি পান নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে একটু নূতন ধরণের মুখ-রোচক দ্রব্য পাতে পড়িলে, তাহা প্রায়ই আদরের সহিত গৃহীত হয়। জানিনা আমাদের এ চাট্‌নি বঙ্গীয় পাঠক-বর্গের কেমন লাগিবে।

আমাদের চাট্‌নির ভাণ্ডের কতিপয় উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। যে গাছে রসাল ফল ভাল ফলে, সেই গাছ হইতে খুঁজিয়া কিছু ফল সংগ্রহ করিয়াছি। ‘পঞ্চানন্দ’ ও ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের দ্বৈমাসিক পত্রিকাগুলির মধ্য হইতে কতিপয় রসজ্ঞ বন্ধুর লিখিত রচনা আমাদের চাট্‌নির ভাণ্ডের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছে। এই রচনাগুলির লেখকগণ এবং পত্রিকা সম্পাদকগণ সাদরে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই চাট্‌নির একটী ভূমিকা লিখিয়া-

দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মোদক বি, এ, মহাশয় এই পুস্তকের 'প্রুফ্' সংশোধন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন; সে জন্য তাঁহার নিকট আমরা বাধিত রহিলাম।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় কভারের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং আমাদের এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে আমাদিগকে বন্ধুবর্গও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিতে হইয়াছে। এজন্য স্থানে স্থানে দুই একটী বর্ণাশুদ্ধি পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। আশা করি, পাঠকবর্গ নিজগুণে এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি,

৬১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩১৯

প্রকাশকদ্বয়

ভূমিকা।

বৃদ্ধ আমি, চাট্‌নীর বেজায় অনুরাগী। সে চাট্‌নী ছেলেরা তৈয়ার করিয়া দিয়াছে। আমি কি আর না বলিতে পারি। আমি আজীবন হাসিয়া আসিয়াছি; এখনও হাসিতেছি। আর কত দিন এমন ভাবে হাসিতে পারিব, জানি না। আমি ছেলেদের হাসিমুখ দেখিতে বড়ই ভালবাসি। আজকালকার ছেলেরা হাসিতে জানেনা, হাসাইতেও পারে না। তাই কচিমুখে হাসি দেখিলে, আমি আর সামলাইতে পারি না। বে-সামাল হইয়াছি বলিয়াই এই ভূমিকা লিখিয়া দিলাম।

আমার বিশ্বাস এই যে, সংসারে যে যত হাসিতে পারে ও হাসাইতে পারে, সে তত সুখী, ততটা সাধু ও সরল আত্মা। যে খানে বিকাশ সেই খানেই হাসি। চাঁদ হাসে, সূর্য্য হাসে, কুসুমরাশি হাসে, নবকিসলয় হাসে; বুঝিবা মৃত্যুও হাসে, দুঃখ-দারিদ্র্য, মহামারী মহার্ঘ্যও হাসে। তবে তুমি আমি হাসিব না কেন? যেমন করিয়া পারি হাসিতেই হইবে—সরল, উদার, প্রসন্ন হাসি হাসিতেই হইবে। ছেলেদের—লেখাপড়া জানা পাশকরা ছেলেদের—এই চাট্‌নীর আস্বাদ পাইয়া আমি হাসিয়াছি। তোমাদিগকেও হাসিতে অনুরোধ করিতেছি। হাসিমুখে উহারা সংসারের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে চাহে। এমন হাসির প্রতিধ্বনি জরাজীর্ণ কণ্ঠেও করিতেই হয়।

সুখ আছে বলিয়াই হাসি আছে। সরলতা আছে বলিয়াই হাসি আছে। চক্ষুষ্মান পুরুষ আছে বলিয়াই হাসি আছে। যে দেখিতে না জানে সে হাসিতে জানেনা, হাসাইতেও পারে না। যেখানে কপটতা সেই খানেই উদ্ভটতা ও উৎকটতা, যে দেখিতে জানে সে জীবনের উদ্ভটতা এবং উৎকটতা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পারে। সুতরাং সে দেশের লোককে হাসাইতেও পারে। যত দিন জীবনের সুখ দুঃখের পরিমাণ টাকার মাপ-কাটিতে করিতে হয় না, ততদিন বেশ সরল হাসি হাসা যায়। ছেলেরা এখন সংসারের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, অখণ্ড মণ্ডলাকার রজতখণ্ডের মহিমা

এখনও বুঝিতে পারে নাই। তাই হাসিতেছে, প্রসন্ন মনে প্রসন্ন চিত্তে হাসিতেছে। তোমরা এ হাসি একবার দেখ।

অনেক দিনের পরে কিশোরের মুখের হাসির জ্যোৎস্না রেখা দেখিতে পাইয়াছি; তাই আমোদে আটখানা হইয়াছি। ভালমন্দের বিচার করি নাই। খাঁটি সামগ্রীটুকু পাঠক পাঠিকার হস্তে তুলিয়া দিতেছি। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রৌঢ় কালের সূচনা পর্য্যন্ত সোদরপ্রতিম সখা, মনস্বী ও মনীষী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ভায়ার সহিত সমান হাসিয়া আসিয়াছি। আজ কয় বৎসর কাল নয়নজলে রুদ্র হাসিকে কোমল করিয়া হাসিবার ও কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছি। তাই এই চাটনীর ভূমিকা আমি লিখিলাম, এই চাটনীর বোতল দ্বিজেন্দ্র লালকে উৎসর্গ করিতে বলিলাম।

একটা সুখের কথা এই যে, এই চাটনীতে কামের—কোৎসিত্যের ধানীলঙ্কা মিশান নাই। সে তীব্র ঝালটুকু অনেকে উপভোগ করিতে পারিবেন না বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে রসের আমাশয় রোগ হইতে তাঁহারা পরিত্রাণ পাইবেন; এটুকু আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

আশীর্ব্বাদ করি ছেলেরা চিরজীবী হউক, চির সুখী হউক-তাহাদের হাসির লহর যেন কখনও উৎকট দুরাশার মরুমারুতেও শুকাইয়া না যায়। হৃদয় মঞ্জুষা পূর্ণ করিয়া সারল্যের সম্ভার লইয়া তাহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের ফুলের সাজি অক্ষয় হউক। ইতি ১৯শে আশ্বিন ১৩১৯ সাল।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
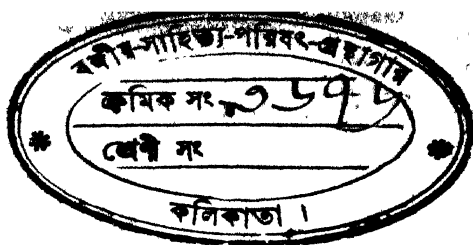
চাট্‌নী।

মজার কথা।

আমার জুতা।

সে আজ অনেক দিনের কথা,—যে দিন কোন বন্ধুর সমভিব্যাহারে, কলিকাতার দক্ষিণে, আমার জুতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কেমন করিয়া বলিব সে সাক্ষাৎ কত মধুর! সে মনোমদ বিনামাসম্পদ;—কতই মানাস্পদ! সেই অতীতের সহিত বর্ত্তমানের স্মৃতিগুলি কেমন মধুর-ভাবে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ব্যতীত কে উপলব্ধি করিতে পারে। দিবসের পর দিবস চলিয়া গেল, কিন্তু সেই সময়ের অবসানের সহিত আমার মমত্বটুকু ত লুপ্ত হয় নাই, ক্রমশঃই যেন উহা বিরহের তীব্রতার সহিত

আমার বিষণ্ণ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। মনে থাকে যেন, আমার এই জুতার সহিত শুধু এক বৎসরের মিলন, তাই বলিয়া বছরের অবসানের সহিত উহার মিলনের মধুর স্মৃতি আমার হৃদয় হইতে সম্যক অপনীত হয় নাই। ভবিষ্যতে যে হইবে তাহাও বোধ হয় না। পাঠকগণ! আমি আজ আপনাদিগকে আমার এই সাম্বাৎসরিক দীর্ঘ বর্ষৈককালব্যাপিনী প্রেমকাহিনী জ্ঞাপন করিব।

প্রথম যে দিন আমার প্রেমাস্পদের সহিত মিলন হইল, সে দিন বাস্তবিকই হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অতি শুভ। আকাশ হইতে যখন সন্ধ্যার কৃষ্ণ-অঞ্চল পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছিল তখন আমি জনৈক বন্ধুর সহিত জুতার পালক পিতার আলয়ে উপনীত হইলাম। বাটীর কর্ত্তা ও কর্ম্মচারিবর্গ আমাদিগকে যে ভাবে সম্ভাষণ করিলেন তাহা আর ভাষায় কি বলিয়া বর্ণনা করিব। আমরা যেন তাঁহাদের কত কালের পরিচিত। আমাদের জন্যই যেন তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত; মূল কথা এই যে আমরা তাঁহাদের নিকট এই প্রকার অভ্যর্থনায় পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলাম—অবশ্য ইহা অপ্রত্যাশিত নহে।

আমার জুতার পিতৃভবনে কিরূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছিলাম, তাহা জানিবার জন্য হয় ত নব্য ও ভব্য পাঠক-

গণ নিতান্ত উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন। কনে দেখ্‌তে গেলে ভদ্রলোকগণ কনের পিতৃ কর্ত্তৃক যে ভাবে আদৃত হয়েন আমরা ঠিক সেইরূপ সমাদরই পাইয়াছিলাম। তবে একটু পার্থক্য ছিল। আমাদিগকে তাঁহারা আহার করিতে বলেন নাই। যাহা হউক আমরা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইলাম। বাটীর কর্ম্মচারী আমাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন। আমাদের সহিত একটু পরামর্শ করিয়াই বাটীর কর্ত্তা 'জুতা'কে ডাকাইলেন। 'জুতা' আসিয়া "লাজনত বধূ"র ন্যায় আমার চরণ প্রান্তে নীরবে স্থান লইল। আহা বেচারী মুখ ফুটিয়া কথাটী কহিল না, আমি তাহার গাত্র স্পর্শ করিতেই সে যেন শিহরিয়া উঠিল। তৎপর যখন বাটীর কর্ম্মচারীর সাহায্যে সম্প্রদান ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল, তখন সে মস্ মস্ করিয়া একটু রোদন করিল। সে রোদন শুধু ক্ষণেকের তরে। অল্পক্ষণ পরেই সে নারব হইল। সে রোদন যে লোকদেখান তাহা বেশ প্রমাণিত হইল, বিশেষ সেটা এখন লোকাচারের একটা অংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ মেয়েরা স্বামিগৃহে আসিবার সময় অন্তরে অন্তরে বেশ ব্যগ্র হইলেও পিতৃগৃহে একটু কাঁদিবেই; আমার এই 'জুতা'ও বোধ হয় সে চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম করিল না। ঐ ক্ষীণ ক্রন্দনের

পর 'জুতা' আমার পায়ে এমন দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হইল যে আমার মনে হইল স্রষ্টা (ভগবান নহেন) উহাকে আমার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর ২।৪টা বাক্য বিনিময়ের পর কিছু রৌপ্যমুদ্রা পণ স্বরূপ দিয়া 'জুতা'কে কাগজের পাল্কীতে করিয়া গৃহে ফিরিলাম। সেই দিন হইতে জুতা সম্পূর্ণ আমার হইল। আমার সুখের জন্য সে আত্ম-সুখ-সম্ভোগ বিসর্জ্জন করিল। অহো, বেচারী আমার জন্য কি না করিয়াছে! সে আমার গৃহে আসিয়া প্রায়ই অভিমান করিত। অবশ্য আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে সে অভিমান কারণশূন্য নহে। প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর অস্তিত্ব জগতে কোন রমণীই সহ্য করিতে পারে না। 'জুতা'ও তাই এই সপত্নীর জন্যই আমার প্রতি অভিমান করিত। আমি প্রায় সকল সময়েই আমার অন্যতম সহচরী "চটী"কে লইয়া থাকিতাম। কারণ আমি যেন তাহার সংসর্গই আরামপ্রদ মনে করিতাম। আমার এই দুর্ব্যবহারে প্রণয়িনী আমার ক্রমশঃই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদা দুর্ভাবনায় চিত্ত আলোড়িত হইলে জীবনের বন্ধন যে শিথিল হইয়া পড়ে তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আমার 'জুতারও' এই শোকাবহ অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিল। আমি যখন তাহাকে লইয়া দীর্ঘ পথ বাহিয়া চলিয়া

যাইতাম তখন সে আমাকে বলিত, "কেবল কি কষ্টের সময়ই আমার প্রয়োজন ? সুখের সময় ত চটি তোমার সহচরী"। আহা সে কথা গুলি যেন আমার কাণে এখনও বাজিতেছে। কে এমন পাষাণপ্রাণ যে এই বুকফাটান বাক্যগুলি জোর করিয়া হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে ! আমি কিন্তু এই বিষাদময় বাক্যগুলি এখনও স্মরণ করিলে দুঃখমিশ্রিত অভিনব সুখের আস্বাদ পাইয়া থাকি। বাস্তবিকই আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম। তবে সে ভালবাসা আমার ব্যবহারে অন্যরূপ আকার ধারণ করিত। আমি তাহাকে যে জ্বালা দিয়াছি তাহা আমি এখন তাহার বিরহে সম্যক উপলব্ধি করিতেছি। ভালবাসার প্রতিদান না মিলিলে জীবন যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে তাহা আমি জানি। কিন্তু কি করিব, তখন আমি সেটা প্রমাণ করিবার অবসর পাই নাই। আমি যে তাহাকে বেশ ভালবাসিতাম, তাহার প্রমাণ এই যে কোন ভদ্র গৃহে যাইবার সময়, কি কোন সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইবার সময়ে আমি তাহাকেই সঙ্গে লইতাম। ইহাই কি অকৃত্রিম ভাল বাসার পরিচায়ক নহে ? আমার অযত্নে সে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল, সে আমাকে ত্যাগ করিবার জন্যই ব্যগ্র হইল, কারণ সে আমার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া 'চটীকে'

আনন্দে নিমগ্ন দেখিতে রাজি নহে। এরূপে তাহার জীবনের অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, সে আমার আশা ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে আশ্রয় লাভ করিল ; সে স্থানে প্রেমে কণ্টক নাই, মিলনে বিরহ নাই। আমি আবার নব পরিণয়ে বদ্ধ হইলাম, কারণ ইহাই জগতের নিয়ম। পুরাতনের স্থান নূতন আসিয়া সদর্পে অধিকার করে। তবে আমার যেন মনে হয় যেমনটী যায় তেমনটী আর হয় না।

হে আমার জুতা, হে দয়িতে মোর, যাও তুমি অমর ধামে চলিয়া যাও, আশীর্ব্বাদ করি তুমি অমর হও, সুখী হও, সে স্বর্গে যেন মান করিয়া ছিন্না ভিন্না হইবার তোমার অবকাশ না ঘটে! ইতি—

"বিরহী"

অভাগার আত্মকথা।

আমি কি করি? কোথায় যাই? যা করিতে যাই তাহাতেই ধাক্কা খাই!

"অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়"।

তথাপি যা হয় একটা করিতেই হইবে। জঠরের জ্বালা, বড় জ্বালা।

Grammarএ দখল কম থাকায় মাষ্টারী জুটিল না। হাতের লেখা ভাল না হওয়ায় Merchant officeএ স্থান পাইলাম না। ভাঁড়ে মা ভবানী বুঝিয়াই Cashier এর কার্য্য কেহ দিল না। জমা খরচের বোধ না থাকায় গোমস্তাগিরিও জুটিল না। একটু মানের দাবী রাখি বলিয়া মুটেগিরিটা করিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ নই বলিয়া রাঁধুনি-বামুনের কাজ করা হইল না। কিন্তু আমি না জানি কি? আমি একজন বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুবক; আমি ইংরাজি জানি, হিন্দি জানি, সংস্কৃত জানি, বাঙ্গালার ত কথাই নাই; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, রসায়ন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই চর্চ্চা রাখি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাই নাই, সেটা শুধু কর্তৃপক্ষদের পরীক্ষার পদ্ধতি ভাল নয় বলিয়া। আমি একজন কবি, সুলেখক ও বটি; তবে কবিতাটা সকলের ভাল লাগে না; কারণ সব সময় মিলাইয়া উঠিতে পারি না। এইবার উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিব। একবার নামটা বাহির করিতে পারিলেই হইল, তারপর আর পায় কে, আমি একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক হইয়া পড়িব।

কিন্তু কার ধরণে লিখি? একটা গুরু তো চাই? মাইকেল মন্দ নয়, হেমবাবুও বেশ, নবীন সেন ত খুবই ভাল, তবে তাঁর ধাঁজে উপন্যাস লেখা বড় কঠিন

ব্যাপার। মনে করিতেছি স্কট্‌কে গুরু করিব, কিন্তু তাহা হইলে তো রাজপুতনা হইতে নায়ক নায়িকা আমদানি করিতে হইবে। রাজপুতনার নায়ক নায়িকা তো উজাড়। 'তুর্গেশনন্দিনী,' 'বঙ্গবিজেতা,' 'রাজসিংহ' ইঁহারাত সেই প্রদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া মনের মতন নায়ক নায়িকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এখন আমার দশা কি হয়। উদ্যান মালতী-মল্লিকা-গোলাপশূন্য—আমি কি শুধু ধুতরা ফুলে মালা গাঁথিব? অহো! কি মন্দ ভাগ্য! নায়ক নায়িকা রাজপুতনা হইতে আনিতে পারিলেই ভাল হইত। নায়ক নায়িকা যুবক যুবতী না হইলেত উপন্যাস চলে না! এ পোড়া বাংলাদেশে যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া যায়। সুতরাং ফাঁকি দিবার যো নাই।

যা হো'ক যখন রাজপুতনায় পাওয়া গেল না, তখন হিমালয় পর্ব্বতে কিংবা দাক্ষিণাত্যে, অথবা ব্রহ্মদেশে যাইতে হইবে। সেই হাজার ক্রোশ দূরে যৌবনে কি বাল্যে বিবাহ হয়, কে দেখিতে গিয়াছে? সেই জন্য নায়ক নায়িকা বাছিয়া লইতে হইলে ঐ সব দেশ হইতে বাছিয়া লওয়াই ভাল। এই সিদ্ধান্ত মতে আমি কয়েকটী উপন্যাস লিখিয়াছি। নূতনত্বত আছেই, মৌলিকত্বও আছে, শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন।

(প্রথম উপন্যাস)

কাশ্মীরের শেষ সীমায় গিল্‌গিট্‌ রাজ্য। তথায় এক সুন্দরী নবযুবতী একটী পুরুষের প্রতীক্ষায় আন্‌চান্‌ করিতেছেন। এক রূপবান্‌ যুবকও একটী সুন্দরীর কামনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। এইরূপ কিছুদিন তাঁহারা করিতে থাকুন। পরে একজন মধ্যস্থ মিলিল, তিনি একমাস মধ্যে মোকর্দ্দমার সুমীমাংসা করিয়া দিলেন।

(দ্বিতীয় উপন্যাস)

হিমালয়ের কোন উপত্যকা—তথাকার একটী রাজ্যের কারাগারে এক রাজপুত্র বন্দী। প্রাণসংশয়, ক্ষত স্থান দিয়া কেবল রক্ত পড়িতেছে। একটী রমণী রাজপুত্রের শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তুমি কেন আমায় বিবাহ করিবে না? তোমার শ্রীচরণে আমার কি অপরাধ হইয়াছে"? রাজপুত্র গোঙাইতে গোঙাইতে উত্তর দিলেন, "তোমার দোষ কিছুই নাই, তবে তোমার একটু পাকাটে পাকাটে গঠন।" রমণী একথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একটু বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

(তৃতীয় উপন্যাস).

সিংহল দ্বীপে চোরাবালিতে পড়িয়া কোন রাজকন্যার

প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে। এক রাজপুত্র অশ্বারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি রাজকন্যাকে তদবস্থায় দেখিয়া কহিলেন, "হে রাজকন্যে! তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে উদ্ধার করি"। রাজকন্যা কহিলেন, "তথাস্তু"। তৎপরে অদূরস্থ কোন তরুতলে গান্ধর্ব্বমতে তাঁহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

দেখুন, উপন্যাস গুলি যদিও হোমিওপ্যাথিক মতে সম্পন্ন হইল, ইহারা "মাদার টিংচার"। এখন ডাইলিউস্‌ন যতই বাড়াইবেন ততই বাড়িবে, ততই অধিক সারযুক্ত হইবে।

এইরূপ সংক্ষেপে জমাট বাঁধিয়া উপন্যাস লিখিবার কারণ এই যে ডাকমাশুল কম লাগিবে এবং পড়িতে সময় নষ্টও কম হইবে। একখানি পোষ্টকার্ডে তিন খানি উপন্যাসই ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপা যাইতে পারে। অন্যত্র পাঠাইবারও খুব সুবিধা। তবে পাঠক মহাশয় এখন আসুন। আপাতত আমি উপন্যাস লিখিতেই থাকি; যদি পরে অন্য কোনও কার্য্যে মনোনিবেশ করি তাহা হইলে জানাইব। ইতি

শ্রীবিদ্যানন্দ দাস বাবাজী।

আয়ুস্তত্ত্ব।

মানুষের পরমায়ু একশত কুড়ি বৎসর। ইহা ভগবৎ সিদ্ধান্ত পৌরাণিক কথা; ইহার উপর আর 'আপীল' চলিবেনা।

সেই পুরাকালে যখন চন্দ্র সূর্য্য নূতন আকাশে উঠিতে আরম্ভ করিল, তখন ব্রহ্মার সৃষ্ট আদি তিনটী জীব একটি মানুষ, একটি বানর, আর একটি শকুনি সৃষ্টি-কর্ত্তার উদ্দেশ্যে গভীর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল। সেই কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার আসন টলিল। একদিন তিনি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের কি প্রার্থনা" ? মানুষটী তাহাদের তিন জনের মুখপাত্রস্বরূপ বলিল, "হে পিতঃ! আমাদের এ জীবন দুর্ব্বহ। আমাদের মৃত্যুর কাল নিরূপণ করিয়া দিন।" ব্রহ্মা শশব্যস্তে উত্তর করিলেন, "ষাট্ ষাট্ ষাট্, তোমরা মরিতে যাইবে কেন ? তোমরা না থাকিলে জগতের জীবজন্তুর জন্ম ও বৃদ্ধি অসম্ভব।" সহসা নারদ রঙ্গভূমে আসিয়া বলিলেন, "হে পিতঃ, আপনি কথার ছলে উহাদিগের পরমায়ু 'ষাট' বৎসর করিয়া দিয়াছেন, এখন আর সহানুভূতিতে ফল কি ?"

মানুষটী বিমর্ষ হইয়া বলিল, "ষাট্ বৎসর পরমায়ু? এত অল্প? জীবনের সকল কার্য্য এত শীঘ্র কি করিয়া শেষ করিব?" অপরদিকে বানর ও শকুনি বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "ভগবান! আমাদিগকে এইরূপ নীচ যোনিতে এত দীর্ঘ কাল থাকিতে হইবে? আপনি কৃপা করিয়া আর কিছু দিন কমাইয়া দিন।"

পিতামহ বলিলেন, "আমার বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। তবে তোমরা পরস্পরে মীমাংসা করিয়া মানবটীকে তোমাদের ত্রিশ ত্রিশ বৎসর দান করিতে পার।"

এরূপ বরদান করিয়া ব্রহ্মা নারদ সহিত অন্তর্দ্ধান করিলেন। তৎপরে শকুনি ও বানর তাহাদের ত্রিশ ত্রিশ বৎসর মানবকে দান করে। তাহাতেই মানুষের বয়স একশকুড়ি হইয়াছে। আর এই জন্যই 'ষাট্' পার হ'লেই মানুষের আকৃতি প্রায় বানরের মত হয় এবং নব্বই পার হইতে না হইতেই মানুষ শকুনির আকার ধারণ করে।

বোধ হয় ডারউইন সাহেব অতি সামান্যই সংস্কৃত জানিতেন, সেই জন্য এই পৌরাণিক কাহিনীটি সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তিনি এক অলীক তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।
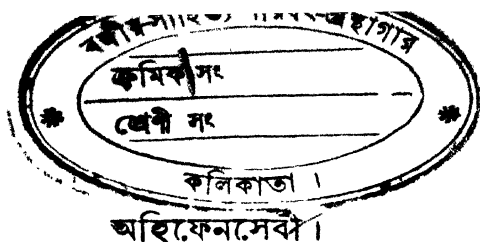
অহিফেনসেবী।

সবাই বলে আমি বড় অত্যধিক মাত্রায় আফিং খাই। আমি নেশার ঝোঁকে কখন কি করি কাহাকে কি বলি, কিছুই ঠিক নাই। আফিং কি কেউ কখনও খায় না, তবে আমার উপর এত চোট্ কেন? গিন্নি বলেন আমি ঝোঁকের মাথায় যা তা বলি; খোঁড়া চাকরটা (কি করি ভাল চাকর রাখিবার পয়সা নাই) বলে,—বাবু তো চব্বিশ ঘণ্টাই ভোঁ হয়ে আছেন; এমন কি ছেলেটা পর্য্যন্ত বলে,—বাবার আবার কথা!

বেশ, আমার মাথার ঠিক নাই তাই সই, তবে আমাকে আফিসে যাবার জন্য এত পীড়াপীড়ি করা কেন? আমি না হ'লে তোমাদের চলে না কেন? না হয় মাস গেলে দশ টাকার আফিং খাই, কিন্তু মাহিয়ানার বাকী ১৫ টাকা তো কই নেশার ঝোঁকে রাস্তায় বিলিয়ে দেই না। কোন কোন মাসে না হয় ২।১ টাকা হারিয়ে ফেলি, তা এমন তো সকলেই ফেলে, কই সবার তো আফিংখোর বলিয়া বদনাম্ নাই? যত রোক্ কেবল এই গরীবের উপর?

আমি বসিলেই ঝিমুই; বিড়বিড় করিয়া যা তা বলি; মাঝে মাঝে নাকি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া

থাকি; এ সব অপবাদের একটা প্রতিকার করিতে হইবে।

আমি ইচ্ছা করিয়া ঘুমাই, উহারা বলে ঝিমাইতেছি। আমি আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলে, উহারা বলে ভুল বকিতেছি, আমি একটু অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া থাকিলে, উহারা বলে ফ্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছি।

বেশ আজ আমি এই আঁধাব ঘরে বসিয়া আছি। সন্ধ্যাদেবী! তোমার ঐ আঁধার মুখখানি আজ আমার বড়ই ভাল লাগিতেছে। আমার আর আলোতে কাজ নাই। যাহার সংসারে একজনও গুণগান করে না, তাহার চির আঁধারই ভাল। আমি আর চাকরি করিব না, আমি দেখিব এ "অহিফেনসেবী" ভিন্ন সংসার চলে কি না?

আমি কি সত্যই ঝিমুই; আমি কি সত্যই যা তা বকি! কই আমিতো কিছুই জানিতে পারি না। আচ্ছা, আজ আর ঝিমাইব না। দেখি, না ঝিমাইয়া থাকিতে পারি কি না।

* * *

আমার আবার চাকরির দরকার কি? আমার কত জমিদারি, কত আফিমের চাষ, কত লোক জন

খাটিতেছে, কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে। আমি চাকরি করিয়া কি করিব?—এঁ্যা, এ সব কি দেখিতেছিলাম! এ সব কি স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম? না, স্বপ্ন ত নয়। আমিত ঠিক বসিয়া আছি। তবে কি বাস্তবিকই আমি ঝিমুই?

তা হলে ত আমি সত্য সত্যই নেশাখোর, আমারই ত ষোল আনা দোষ। কই এত করিয়া ত এ কথা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। আজ কেন আমি এর মীমাংসার জন্য এত ব্যস্ত? যাই হো'ক, যখন ধরিয়াছি, তখন শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না। আজ আমি স্থির জানিতে চাই আমি নেশাখোর কি না? হে নিদ্রাদেবী! তুমি আজকের জন্য অভাগার নিকট হইতে বিদায় লও। আজ তোমার ও কোমল ক্রোড় চাহি না। আজ তোমার ও স্নেহস্পর্শে ভুলিব না। কেন বৃথা সময় নষ্ট করিবে? অন্যত্র চেষ্টা কর, দেখ যদি কোনও বিরহপীড়িত হৃদয়কে কিছু শান্তি দিতে পার। এখানে যে প্রয়াস করিবে, সেখানে করিলে হয় ত কোনও হতভাগ্যকে সুখী করিতে পারিবে; কিন্তু এখানে আজ তোমার বৃথা চেষ্টা।

* * *

বাঃ! এমন মজা তো কখনও দেখিনি। আস্‌চো?

এসো। খাপরার চালের ফুটো দিয়ে নিঃশব্দে ঢুক্‌চো! ঢোকো। অন্ধকার ঘরে দেখতে পাবে না বলে লণ্ঠন নিয়ে আস্‌চো? এসে কি হবে? আমি কিন্তু এখনও ঘুমোইনি! তোমার চালাকি খাটলো কই! ভগবান! এই মশক জীবকে কি চতুর করেই সৃষ্টি করেছ।—

এ্যাঁ! আমি একি দেখিতে ছিলাম? এত মশা নয়, এ যে জোনাকি। তবে কি আমার গিন্নির কথাই ঠিক্—আমি কি সত্য সত্যই—'আফিং খোর'? ইতি—

অহিফেনসেবী।

ডিম্বভক্ষণের শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

শুনিতে পাই ভট্টপল্লীর সভাতে স্থির হইয়া গিয়াছে যে ডিম্ব খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি সে নিষেধ মানিয়া চলিতে মোটেই রাজী নই। আমি যে শাস্ত্র অমান্য করি তাহা নহে। আসল কথা ডিম্বের নাম শুনিলেই আমার মুখে জল আসে। বিশেষতঃ, ডিম্ব যে সকলেরই ভক্ষ্য সে বিষয়ে কয়েকটি অকাট্য যুক্তিও দেখাইব।

সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা। তখন আমি ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। একদিন গুরুমহাশয় বলিলেন—"হংসাণ্ড

সমাস বিশ্লেষণ করতো"। আমি বলিলাম, "হংসের অণ্ড = হংসাণ্ড।" অমনি পৃষ্ঠদেশে সপাসপ বেত্রাঘাত! তার পর তিনি গর্জ্জন করিতে করিতে উত্তর করিলেন, "হংস পুংলিঙ্গ, তাহার আবার ডিম্ব হইবে কি প্রকারে? হংসীর অণ্ড = হংসাণ্ড"। ভাবিলাম যার সমাসে এত ভাব তার অভ্যন্তরে কতই না জানি রহস্য জড়িত আছে। বাড়ীতে গিয়াই ঠাকুরকে বলিলাম "ঠাকুর, হংসীর অণ্ড = হংসাণ্ড রান্না করতো।"

কি খাইলাম আহা! ভুলিতে পারি নাই, আর এ জীবনে সে আস্বাদ ভুলিতে পারিবও না। সেই অবধি ডিম্বতত্ত্ব বিশ্লেষণে মনঃসংযোগ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা একে একে নীচে বিবৃত করিতেছি।

১। আপনারা সকলেই জানেন ব্রহ্মার অণ্ড হইতে এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জন্য এই পৃথিবীর অন্য নাম ব্রহ্মাণ্ড। যখন ব্রহ্মার অণ্ডতে আমরা বাস করিতেছি তখন ব্রহ্মার বাহন যে হংস তাহার অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব কি জন্য ভক্ষণ করিব না তাহা বুঝিতে পারিনা। এহেন হংসডিম্বের প্রতি যে পাপাত্মা অবজ্ঞা করিবে তাহাকে অন্তিমে অনন্ত নিরয় ভোগ করিতে হইবে।

২। দার্শনিকগণ চিরকালই ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ববিশ্লেষণ করিতে উৎসুক। তাঁহারা যদি হংসাণ্ড খান তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য বুঝিতে পারিবেন।

৩। Zeroর উপর গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি। '০' ছাড়া গণিত শাস্ত্রের মহিমা বুঝা দুঃসাধ্য। সেই '০'র সহিত ডিম্বের অত্যন্ত সাদৃশ্য। এবং '০' কে গণিতশাস্ত্রে প্রধান স্থান দিয়াছে কেন, জানেন কি? আদিকালে যখন গণিতশাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল না, তখনও ১।১ জন সমাজের নিষেধ সত্ত্বেও এই উপাদেয় বস্তু ভক্ষণের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। সেই ডিম্ব ভক্ষণের ফলে তাঁহারা উত্তরোত্তর অধিক মেধাবী ও বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন (ডিম্বের এতই গুণ)। তাঁহাদের দ্বারাই প্রথম গণিতশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। তাঁহারা যে ডিম্ব ভক্ষণের জন্যই গণিত-শাস্ত্রের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই জন্যই '০' কে প্রধান স্থান দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধিই '০' গণিতশাস্ত্রে প্রধান স্থান পাইয়া আসিতেছে।

৪। সত্য হইতে আরম্ভ করিয়া কলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমাজেই ডিম্ব-পাক-প্রণালী ছিল। ডিম্ব খাইতেন বলিয়া রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিয়া-ছিলেন, ডিম্ব খাইতেন বলিয়া পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। ডিম্ব খাইতেন বলিয়াই

বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের জীবন দান করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা না হইলে পারিতেন কি না সন্দেহ। আমি খট্টাঙ্গপুরাণ হইতে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখাইতে পারি।

৫। হরিভক্তদের ডিম্ব অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ আহার, কারণ ইহাতে রক্ত নাই। যে জিনিষে রক্ত আছে তাহা আমিষ, কাজেই ডিম্ব নিরামিষ। বরং শাকশব্জীর প্রাণ আছে কারণ ডাক্তার বসু তাহার প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য বসু আজ পর্য্যন্তও প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে ডিম্বের প্রাণ আছে, বিশেষতঃ যদি গঙ্গাজলে সিদ্ধ হয়। হরি! হরি!! তাহা হইলে তো বাবাজীদের আর কথাই নাই।

ফুট্‌বলের অভিযোগ।

আমি ফুট্‌বল। আমাকে বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। আমার সুগোল বপুখানি আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন। আজ আপনাদিগকে আমার দুঃখের কথা জানাইব। যে দুঃখে আমার প্রাণ যাইবার

উপক্রম হইয়াছে, আজ তাহার ২।১টী করুণ কাহিনী একবার শুনিবেন কি ?

কবে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি ঠিক বলিতে পারি না। তবে দৈববশে আমার পূর্ব্বজন্মের কথা কিছু কিছু মনে আছে। তখন আমি কোনও পশুবিশেষের গাত্রাবরণ ছিলাম মাত্র। পূর্ব্বজন্মে ছিলাম ভাল। আমার মনিব আমাকে ভারি যত্ন করিতেন। রোজ দুই বেলা আমাকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিতেন ; পাছে আমার কোনও ব্যাধি জন্মে সেজন্য তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। আমারও, প্রভুর আদরে ও যত্নে, দিনে দিনে বর্দ্ধিত কলেবর, বেশ সুখে দিন কাটিতে লাগিল। তখন ভাবিয়াছিলাম আমার জীবন কি সুখের, ক্ষণেকের তরেও ভাবি নাই যে আমার স্বাস্থ্যই আমার সর্ব্বনাশের মূল। যদি আমি এত হৃষ্টপুষ্ট না হইতাম, তাহা হইলে হয়ত আমাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না! সে যাক্‌গে কি বলিতেছিলাম—হাঁ, তারপর একদিন দেখি আমার মনিব ভারি ব্যস্ত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমার নিকট আসিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শেষে বুঝিলাম আমি ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। তারপর সব অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, আর কিছুই মনে নাই ;

শুধু আমার মনিবের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস এখনও আমার কাণে বাজিয়া আছে।

কিছুদিন যে কি ভাবে গিয়াছে কিছুই জানিনা। হঠাৎ একদিন অনুভবে বুঝিলাম, একটা বিকটদর্শন মুচি আমাকে ভীষণ ভাবে ঘসিতেছে। তারপর সে আমাকে কাটিয়া ছাটিয়া, জোড়া তালি দিয়া এক নূতন আকারে গঠন করিয়া তুলিল। নূতন চেহারাটা আমার বেশ পছন্দসইও হইয়াছিল। অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম আমি আর মুচির ঘরে নাই। বৈদ্যুতিক আলোকে সুশোভিত এক প্রশস্ত কক্ষের একটী প্রকাণ্ড আলমারিতে আমি শুইয়া আছি। এখানে আমি ভারি আদরে ছিলাম। আমার জন্য একটী চাকর ছিল। পাছে আমার গায়ে ধূলা লাগে সেজন্য রোজ আমার গা ঝাড়িয়া দিত।

কিছুদিন পরে আমার নূতন মনিব হঠাৎ এক দিন আমাকে ঠেলিয়া তুলিলেন, ভাবিলাম আবার না জানি কপালে কি আছে। ওঃ হরি, এ যে ভারি সুখবর! আজ এখনই, আমার বিবাহ। কনে দেখিয়াছি লাল টুক্‌টুকে। বিবাহে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কারণ কনেকে আমার অন্নবস্ত্র যোগাইতে হইবে না। তিনি বায়ুজীবী।

শুভবিবাহ হইয়া গেল। সম্প্রদানটা, বোধ হয় আমার মনিবের কোনও সহকারী করিয়াছিলেন। বিবাহের পর আমি তাহাকে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া রাখিলাম। সে যখন বেশ এক পেট বায়ু ভক্ষণ করিয়া আমার কোলে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন আমিও আনন্দে অভিমানে ফুলিয়া উঠিতাম; কখন বা আনন্দে নাচিতে থাকিতাম। বড় সুখের সময় মনে হয় চিরদিন বুঝি এই ভাবে যাইবে, দুঃখের দিন বুঝি সব কাটিয়া গিয়াছে। একদিন আমার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম একটা কোটরাগতচক্ষু, রোগা, কাল, ছিপ্‌ছিপে ছোক্‌রা সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আমার নিকট আসিল এবং কি জানি কি মনে করিয়া বধূকে আহার দিয়া আমার মুখটী বন্ধ করিয়া দিল।

এই আমার দুঃখের প্রারম্ভ। তারপর দেখি আমি (সস্ত্রীক) কতকগুলি ছেলের মাঝখানে পড়িয়া আছি। হঠাৎ এক বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলাম। তারপর যে পায়, সেই আমাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে লাথি মারিতে লাগিল। আমার লাগিয়াছে সে কথা না ভাবিয়া পাছে আমার—আহা,—তাহার লাগে সেই ভাবনায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম; এবং যথা সম্ভব তাহাকে সস্নেহে ঘিরিয়া রহিলাম।

কত শত শত লাথি খাইয়াছি তাহা আমি গণনা করিয়া বলিতে পারিব না। শুধু লাথি নয়, মাঝে মাঝে দুই একবার কয়েকটী ঘুসিও বেশ খাইয়াছি। দুঃখে কষ্টে প্রাণ যায়-যায়, তবুও যায় না কেন? এ দুঃখ ব্যথার ব্যথী ছাড়া আর কে বুঝিবে? তার উপর আমি নব-বিবাহিত, সস্ত্রীক প্রপীড়িত। আচ্ছা, একবার জিজ্ঞাসা করি,—"আমি কি দোষ করিয়াছি? এ গরীবের উপর এত অত্যাচার কেন?"

স্ত্রীজাতিকে সম্মান দেখাইবার জন্যই বোধ হয় যেন কচিৎ ২।১ বার ছেলেগুলি আমায় শুদ্ধ মাথায় লইয়া থাকে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তারপর আবার যে লাথি সেই লাথি।

তাই বলিতেছিলাম আমার এ দুঃখ আপনারা বুঝিবেন কি? আমার এ করুণ ক্রন্দন কিছু অনুভব করিবেন কি?

বালকেরা অনবরত আমাদিগকে পদাঘাত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। পৃথিবীর আনন্দ এইরূপই বটে। কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষ মাস। কিন্তু আমি বিশ্বপ্রেমিক। তাই এ হেন দুঃখেও আমার মনে একটু সুখের সঞ্চার হয়, যে আমার জন্যই ছেলেরা এই আমোদটুকু পাইতেছে।

কিন্তু আমার যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন রেহাই দিলেই বাঁচি। যাক্ আর আপনাদিগকে করুণ সঙ্গীত শুনাইবনা। দেখি আজিকার ক্রন্দনের ফলে আপনারা এ বিষয়ের কি প্রতীকার করেন। তবে এখন আসি, নমস্কার।

বিনীত 'শ্রীফুটবল'।
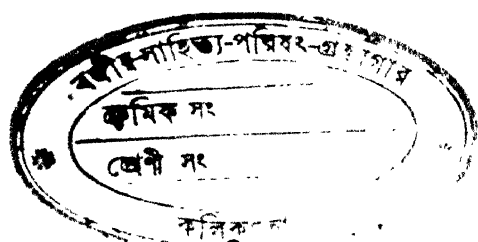
রগড়ের গল্প।

প্রত্যুত্তর।

দণ্ডধারী মুখোপাধ্যায় ওরফে মিষ্টার মুখার্জ্জি হোসেঙ্গাবাদের দ্বিতীয় মুন্সেফ। লোকটার মেজাজ ভারি খিট্‌খিটে—অন্যান্য বিচারকগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি যে এককালে উকিল ছিলেন, তাহা কি জানি একেবারে ভুলিয়া গিয়া উকিলদের সহিত কখনও কখনও কেমন যেন ব্যবহার করেন।

আজ তাঁহার কোর্টে একটী মোকদ্দমার শুনানী আছে। আসামী মহানন্দ বাগ্‌দী। বেচারীর নামে তাহার মনিব বাকী খাজনার দায়ে এক মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। অপরাধ সে এবার মাথট্ দিতে নারাজ। মহানন্দ গরীব। উকিল দিতে পারে নাই। মুন্সেফ দেখিলেন আসামীপক্ষে উকিল নাই। মহানন্দকে বলিলেন, "দেখ্‌না বার লাইব্রেরীর সাম্‌নে কত উকিল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দৈনিক চার ছয় আনা দিলেই তোর পক্ষ সমর্থন করবে। যা একবার দেখে আয়।"

বলা বাহুল্য মিঃ মুখার্জ্জির এই সদুপদেশপূর্ণ

যুক্তি অনেক গণ্যমান্য উকিল শুনিয়াছিলেন। মহানন্দ উকিল অন্বেষণ শেষ করিয়া বিষণ্ণ মুখে কোর্টে ফিরিয়া আসিলে মুন্সেফ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে উকিল পেয়েছিস্?"

মহানন্দ যোড়হাত করিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! উকিল বাবুরা বলিলেন, চার ছয় আনার উকিল এখন আর নাই। যে কটা ছিল সে সবই মুন্সেফ হইয়া গিয়াছে"।

গোবরার মা।

গোবরার মা বড়ই দুঃখিনী। তাহার সন্তান জন্মিয়াই মরিয়া যাইত। কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ সাতটী পুত্র মরিবার পর অষ্টম পুত্র গোবরা ঈশ্বরানুগ্রহে পোনের বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। কাজে কাজেই গোবরা বড় আদরের ধন। তবে অপত্যস্নেহের মাত্রাটা কিছু অধিক ছিল। যদিও ছেলেকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিত কিন্তু উহার লেখাপড়ার দিকে গোবরার মা মোটেই নজর দিত না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে লেখা-পড়া না শিখিলেই বা চলিবে কেন? সেই জন্য আজ ৩।৪

বৎসর হইল গোবরা পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গোবরার মা বহুদিন পিতৃগৃহে যায় নাই। কয়েক মাস হইল তাহার পঞ্চদশবর্ষীয় বালককে সঙ্গে লইয়া বাপের বাড়ী গেল। সেখানে ছেলের লেখাপড়ার ভার তাহার দাদার উপর অর্পিত হইল। দাদা প্রতিদিন ভোর বেলা গোবরাকে পড়ান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অতি আদরে গোবরা একেবারে "প্রহ্লাদ" হইয়া উঠিয়াছিল। সে যা তা উত্তর দিয়া বসিত, কিন্তু উত্তর দিতে পরাঙ্মুখ হইত না। কাজেই দাদা গোবরার উপর ভারি চটা, কিন্তু গোবরার মার একমাত্র ছেলের উপর হাত তুলিতেন না। নিজের ক্রোধ নিজেই সম্বরণ করিতেন। একদিন গোবরার মা, তাহার ছেলের পড়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেকে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখিয়া মায়ের মনে আনন্দের সীমা রহিল না। দাদা কিন্তু ভারি চটিতেছিলেন। দাদা প্রশ্ন করিলেন, "বল্‌ত গোবরা—তিন পোনেরয় কত?"

গোবরা—৬৪

দাদা—চার এগারয়?

গোবরা—১২৫

দাদা—পাঁচ কড়ায় কত গণ্ডা?

গোবরা—ছয় গণ্ডা সাত কড়া।

মায়ের আনন্দ ধরে না : পুত্রকে অসামান্য মেধাবী মনে করিয়া গোবরার মা মনে মনে ঈশ্বরের কাছে তাহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল এবং স্ফীতগর্ব্ব হইয়া গদগদ স্বরে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, গোবরা কি আমার বাঁচবে" ! দাদা একেত আগে হইতেই অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছিলেন, তাহার উপর এই স্নেহের উচ্ছ্বাস ও আদরের চূড়ান্ত আব্দার শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, তোমার খাতিরে আমার হাতে ত বাঁচিয়া গেল, কিন্তু আর কাহারও নিকট বাঁচিবে কিনা সন্দেহ।"

গভীর পাণ্ডিত্য।

রামশরণ তর্কবাগীশ তর্কশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। প্রত্যেক নিমন্ত্রণেই তাঁহার যোল আনা বিদায় মিলিত। এযাবৎ কোন তর্ক সভায় তিনি পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কেহ কখনও শোনে নাই। একদিন বিবাহ উপলক্ষে এক সভায় তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। সেখান হইতে নানাবিধ উপহার সম্ভার লইয়া তিনি যে সভায় সকল পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করিয়াছেন মনে মনে তাহার

আলোচনা করিতে করিতে গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহিণীকে প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট দেখিয়া ব্রাহ্মণের কৌতুক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহিণী, তুমি কোন্ গোত্র!" গৃহিণী তো প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক্, ভাবিলেন ব্রাহ্মণ কি পাগল হইল। কিন্তু আপাততঃ মত্ততার কোন কারণ না দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "কেন, এই বুঝি তোমার বিদ্যা! এই বিদ্যা লইয়াই দেশে বিদেশে তর্ক করিয়া বেড়াও। তুমি যে গোত্র আমিও সেই গোত্র। এটাও কি স্ত্রীর নিকট শিখিতে হইবে!" ব্রাহ্মণ তো রাগিয়া লাল। ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, বলিলেন—"কি পাপীয়সি! আমার পিতার উপর দোষারোপ! তোর নরকেও স্থান হইবে না। ওরে মূর্খে! আমার পিতা কি এতই নির্ব্বোধ ছিলেন যে এই সামান্য শাস্ত্র নিয়মটা জানিতেন না যে সমান গোত্রে বিবাহ হয় না! আমার বাপ এমন অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিবেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর।" ব্রাহ্মণের এই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া গৃহিণীর চক্ষু স্থির এবং বাক্‌শক্তি রহিত। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, তাইতো যদি ব্রাহ্মণীর কথাই ঠিক হয় তবে আমাদের বিবাহ ত নিশ্চয়ই অসিদ্ধ। হায় একি হইল! কি মহাপাতক করিয়াছি। পিতৃদেবের মধ্যে মধ্যে মস্তক

বিকৃত হইত বলিয়া মার নিকট শুনিয়াছি। ওঃ ভগবা ন, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ? এরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণীর মোহ ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণের বুদ্ধি নিতান্তই লোপ পাইয়াছে। নচেৎ তাঁহার ন্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কি জানেন না যে বিবাহের পর কন্যা স্বীয় গোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামীর গোত্র অবলম্বন করে। ব্রাহ্মণী কালবিলম্ব না করিয়া দেবরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাকে স্বামীর উদ্দেশে পাঠাইলেন।

ভ্রাতা বাহিরে যাইয়া দেখেন তর্কবাগীশ মহাশয় একমনে আপনার চাদর একটা আম গাছের তিন হাত উচ্চে এক ডালে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিতেছেন।

বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য পাশের ঘরের বারান্দায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে ভাবিতেছে বামুনের মতলবটা কি ?

ব্যুৎপত্তি।

মৌলবি সাহেবের ধারণা বাঙ্গলা ভাষায় তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, যেহেতু তিনি বোধোদয় একবার

নয়, দুইবার শেষ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ, বিশেষতঃ হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সে পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে একেবারে নারাজ। কাজেই মৌলবি সাহেব তাঁহার উপর ভারি চটা ছিলেন।

তিনি যে বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী তাহার পরিচয় দিবার জন্য বহু দিন যাবৎ সুযোগ খুঁজিতে-ছিলেন। অচিরে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর বাবু আসিয়াছেন। মৌলবি সাহেব মুসলমান ছাত্রদিগকে বাংলা হইতে পার্শিতে অনুবাদ করাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়া প্রশ্ন দিতে লাগিলেন।

"মিয়া হগল্ ছিলট্ হাতে নও। পইলা নম্বরে নেহ,—একটা বির্‌খের শাহার উপুর একটা পাহি বসিয়া ডাক সুরু কর্‌ছে" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—"জল্‌দি হাত চালাইয়া ফছর ফছর নেহ"।

"নেহ দুছ্‌রা নম্বরে—এহান থনে রাজবাড়ীর ইমারত আচ্ছা খুছরত দেহা যায়,—নেহ নেহ, ফছর ফছর নেহ।"

এই পর্য্যন্ত শুনিবামাত্রই ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "আর নেহিতে হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু মনে মনে ভারি খুসী হইয়াছেন

ভাবিয়া মৌলবি সাহেব ইহাই উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধির কথা ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে জানাইলেন। মৌলবি সাহেবের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল কিনা জানি না, তবে ইন্‌স্পেক্টর বাবু যাওয়ার পর হইতেই মৌলবি সাহেবকে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ দেখা যাইত।

সূক্ষ্ম বিচার।

একদা কিট্‌কিটাম্বর তর্কচঞ্চু মহাশয় একাকী শান্তিতে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী 'দা' হস্তে আসিয়া বলিলেন, "যাও একটা কলা গাছ কাটিয়া থোড় লইয়া আইস। যে গাছের মোচা ভাল হয় নাই এরূপ দেখিয়া কাটিও, বেশ নরম হইবে।" ব্রাহ্মণ 'দা' হস্তে কলাবাগানে যাইয়া গবেষণা করিতে লাগিলেন—একটী গর্ভিনী কদলী বৃক্ষ—কাটিতে হইবে। কিন্তু গর্ভিনী কদলী বৃক্ষ চিনিয়া উঠা দুষ্কর। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, "ক্ষীণদেহো গর্ভিনী লক্ষণম্"। অতএব যে গাছগুলি সরু সে গুলিতে নিশ্চয়ই নরম থোড় হইবে। এই ভাবিয়া তিনি একটা ছোট সরু কলাগাছকে গর্ভিনী সাব্যস্ত করিয়া সেটাকে

দুই কোপে ছেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে থোড় না দেখিয়া ভাবিলেন, ‘এ গাছটী হয়ত রোগে কৃশ হইয়া থাকিবে’। এইরূপে বাগানের প্রায় সমস্ত ছোট কলাগাছ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণী এত বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং বাগানে আসিলেন, এবং স্বামীর কীর্ত্তি দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সতর্কতা।

রামবাবু শ্যামবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছেন। উভয় বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় মেঘ করিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শ্যামবাবু বলিলেন, “ওহে, তোমার আজ আর বাড়ী গিয়ে কাজ নাই। আজ এখানে থেকে যাও। এত ঝড় বৃষ্টি”। শ্যামবাবু বাড়ীতে বলিতে গেলেন ‘আজ যেন খিঁচুড়ি হয়’। কি জানি কেন বাড়ীতে একটু দেরী হইল। আসিয়া দেখেন রামবাবু নাই। ঘণ্টাখানেক পরে দেখিলেন রামবাবু ভিজিতে ভিজিতে চলিয়া আসিতেছেন। শ্যামবাবু উহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিহে, এ বৃষ্টিতে কোথায় গিয়েছিলে ?” রামবাবু উত্তর করিলেন, “এই একটু

বাড়ীতে বলিতে গিয়েছিলেম যে আজ বড় বৃষ্টি, আর বাড়ী আসতে পারবো না।"

আমি জানিনা ?

একদিন ৯ জন কৃষক রেলে করিয়া তিন পাহাড়ী হইতে বোলপুর যাইতেছিল। তাহারা যখন বোলপুরের টিকিট কলেক্টরকে টিকিট দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন "টিকিট কলেক্টর" দেখিলেন ৯ জন লোক যাইতেছে অথচ ৮ খানি মাত্র টিকিট দিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর একজনের টিকিট ?" একজন প্রবীন কৃষক উত্তর করিল, "তুমি কুড়ি বছরের ছোকরা আর আমার সঙ্গে চালাকি ? আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে আজ ৩০ বৎসর ধরে রেল যেতে দেখেছি, আর তুমি আসচো আমাকে ঠকাতে। মনে করেছ আমি জানিনা যে ১৫ সের ওজনের জিনিস এক এক জন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের 'রামুর' ওজন ত আর ১ এক মণের বেশী হইবে না ? না হয় দেড় মণই হ'ল ?

টিকিট কলেক্টর তো অবাক্‌

মনুষ্যবিজ্ঞান

কৌতুক

ঠিক যেমন একই বস্তু—তিন আকার ধারণ করিতে পারে, যথা বাষ্প জল ও বরফ; তেম্‌নি নারীগণও অবস্থাভেদে তিনটি বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া থাকেন। অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা বালিকারা 'বায়বীয়' অবস্থায় থাকে; পৃথিবীর ২০।২৫ বৎসরের 'শৈত্যে' বাষ্পধর্ম্মী বালিকা 'তরল' যুবতীতে পরিণত হয়। ৫০ বৎসরব্যাপী পৃথিবীর 'শৈত্যে' এবং দুঃখকষ্টের শোক তাপের শীতল কন্‌কনে উত্তুরে বাতাসে অমন যে তরল যুবতী সেও জড়ভাবাপন্না বৃদ্ধা হইয়া পড়েন।

অল্পবয়স্কা বালিকারা যে বাষ্পধর্ম্মী ইহাও কি বুঝাইতে হইবে? অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা বালিকারা যে পাড়ায় পাড়ায় ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায় ইহাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে তাহারা 'অতি সহজেই ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারে'?

বয়লি সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে "চাপ (pressure) দ্বারা বায়ুর আয়তন (Volume) ইচ্ছামত কমান বা বাড়ান যায়; কিন্তু চাপ তুলিয়া লইবা মাত্র

বায়ু পূর্ব্বের আয়তন পুনঃপ্রাপ্ত হয়"। পিতামাতার একটু গালিতে বা একটু ধমকে 'চাপ' না পড়িবা মাত্রই বালিকা ম্লান মুখ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া পড়ে। পিতা সোহাগ করিয়া একটা মাত্র কথা যেই বলিবেন (অর্থাৎ 'চাপ' তুলিয়া লইবেন) অমনি বালকা কত প্রসারিত হইবে! সুকোমল বাহুদুটী তৎক্ষণাৎ পিতার গ্রীবা জড়াইয়া ধরিবে, এবং একটু পরে বিপুল জগতে আপনাকে প্রসারিত করিয়া ফেলিবে!

বালিকা কি বয়লি সাহেবের মতে বাষ্পধর্ম্মী নয়?

জল যে তরল পদার্থ ইহা বোধ হয় পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। প্যাসকেল সাহেব জলের দুইটী ধর্ম্ম বা প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (১) "হাজার 'চাপ' দিলেও জলের আয়তন কিছুতেই কমিবে না"। (২) "জলের একদিকে চাপ দিলে সে চাপটা চারিদিকে প্রকাশ পাইবে।"

আবার নারীদের মধ্যে যখন যুবতীরা হচ্ছে তরল, তখন কি আর তারা জলের স্বভাব পাবে না? তাদের হাসিভরা মুখখানি জলের মত ঢল ঢল; একটু অনুকূল বাতাস পেলেই তাহাদের সর্ব্বশরীরে একটা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ উঠে। জলে যেমন নৌকা ভাসাইয়া কত দেশ

বিদেশে যাইতে পারি, তেমনি নারীদের এই তরল সৌন্দর্য্যে গা ঢালিয়া কত যুবক কত নন্দন কানন কত অমরাবতী দেখিয়া আসিয়াছে, যাহাদের এ সৌভাগ্য হয় নাই তাহাদের দুর্ভাগ্য।

যুবতীরা যে তরল তাহা কল্পনাপ্রসূত নয়, কারণ কবিইত গাহিয়াছেন, "তোমরা (নারী) হাসিয়া বহিয়া যাও কুলুকুলু কল নদীর স্রোতের মত"।

প্যাসকেলের Lawটা যুবতীদের পক্ষে খাটে কি না দেখা যাক্। দেখি চাপ দ্বারা যুবতীরা সঙ্কুচিত হয় কি না! আফিসের সময় হইয়াছে। বড় বৌ ছোট বৌ অনেক ডাকাডাকি করিয়া শেষে শাশুড়ী ঠাকরুণ ছেলের জন্য রান্না চড়িয়েছেন। রান্নাঘরে নুন্ নেই। অথচ ভাত-ডাল-ব্যঞ্জন খালি ঘরে রাখিয়া অন্য ঘর হইতে নুন্ আনিতে পারিতেছেন না। শাশুড়ী ডাকিলেন 'বড় বৌ একটু নুন্ দিয়ে যাওত'। কিন্তু কৈ কোন সাড়াত নাই! (তখন তাস 'ধরা' নিয়ে বৌ মহলে মহা গোলযোগ উপস্থিত)। ক্রমে "লক্ষ্মী বৌমা" থেকে একেবারে "ও আবাগীর বেটী, তোর সোয়ামী আফিসে যাবে তা পাকের গরজ আমার না তোর? আমি বুড়ো রান্না করছি আর সোনার চাঁদেরা আমার মুখে তাস খেলছেন"!

কই তবুও ত বৌ নুন্ নিয়ে হাজির হ'ল না।

শাশুড়ী ঠাকরুণের এত 'চাপে'ও কি বৌ একটু মাত্রও সঙ্কুচিত হ'ল? হবে কেন? তরল পদার্থের যে আদতেই সেটা ধর্ম্ম নয়।

আবার সেদিন বড় সাহেবের সহিত এ বাড়ীর বাবুর একটু 'চটাচটি' হইয়াছিল। বাবু বিষণ্ণমনে বাড়ী ফিরে গিন্নিকে একটু বকেছিলেন। গিন্নির উপর একটা অন্যায় 'চাপ' পড়েছিল, তাহা কি তাহার চোখের জলেই প্রকাশ হ'ল? না তাহার চোখে, মুখে, নাকে, কাণে, ঠোঁটে, চুলে, হাবভাবে হাঁটার ভঙ্গিতে, বাহু নাড়ানের কায়দায়, আঁচলবদ্ধ চাবির ঝন্ঝনিতে বেশ বোঝা গেল যে গিন্নির উপর একটা 'চাপ' পড়েছে। চাপের লক্ষণটা যে চারিদিকে সমান ভাবে প্রকাশ পাবে এটাত তরল পদার্থের ধর্ম্ম।

বৃদ্ধারা যে জড়ভাবাপন্না তাহা কি ঠাকুরমাকে দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায় না? ঠাকুরমা ত দেয়ালের গায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া সূতা কাটা, তরকারি কাটা, চাকরকে হুকুম দেওয়া, বৌকে ধমক্ দেওয়া, 'চাট্‌নী' তৈয়ারি করা, শিব পূজা করা ইত্যাদি সমস্ত কাজগুলি করিতেছেন; কই আপনার জায়গা হইতেত একটুও সরিয়া যান নাই! জড় বস্তুর কি ইহাই ধর্ম্ম নয় যে যেখানে রাখিবে সেই খানেই থাকিবে?

আর বার যখন পূজার ছুটীতে ঠাকুরমা, কাকীমা ও তাঁহার ছোট মেয়েটীকে লইয়া কাশী গিয়াছিলাম তখন গাড়ী হইতে ট্রাঙ্ক পেটেরার মত ঠাকুরমাকেও নামাইয়া যেখানে রাখা গিয়াছিল ঠিক সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। জড়বস্তুর কি ইহাই ধর্ম্ম নয় যে উহাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরাইতে পারা যায়?

কিন্তু ছোট কাকীমার মেয়েটী এমন ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়া দিল যে তাহাকে সামলান দায় হইয়া পড়িল। ছোট কাকীমা যদিও ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু তবুও তাঁহার চোখদুটী ইতস্ততঃ ছুটোছুটী করিতেছিল। একটী বাটীর মধ্যে জল রাখিয়া যদি বাটীটা নড়ান যায় তবে জল যেমন বাটীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও 'ছলকিয়া' উঠে, কাকীমার চোখদুটিও নূতন সহর দেখিয়া 'ছলকিয়া' উঠিতেছিল। ইহাই কি বেশ প্রমাণ নয় যে ঠাকুরমা জড়, কাকীমা 'তরল' ও মেয়েটি বাষ্পধর্ম্মী?

রাসায়নিক সংযোগ।

রাসায়নিক শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে উদ্‌জান বায়ুর (Hydrogen gas) ধর্ম্ম (property) এক রকম অম্লজান বায়ুর (Oxygen) ধর্ম্ম অন্য রকম। কিন্তু তাহাদের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি (affinity) এই দুইটী

বিভিন্ন ধর্ম্মসমন্বিত বায়ুর সংযোগ করিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জিনিষ (অর্থাৎ জল) সৃষ্টি করে। তাহাতে এই দুইটী বায়ুর একটীরও ধর্ম্ম লক্ষিত হয় না।

অমূল্য এবার B. A. পাশ করিয়াছে। সে বড় স্বল্পভাষী। বন্ধু বান্ধবের, এমন কি বাপ মায়ের সঙ্গে পর্য্যন্ত দুটি একটার বেশী কথা বলিত না। আবার সুভাষিণী বড় বেশী কথা বলিত; এবং উচ্চস্বরে ভিন্ন নিম্নস্বরে কথা বলিতে পারিত না। এই জন্য করুণাময় বাবু সুভাষিণীকে অনেক সময় ভর্ৎসনা করিতেন।

কিন্তু (Hydrogen) ও (Oxygen) মিশে যখন জল হ'ল, অর্থাৎ অমূল্য ও সুভা মিলিয়া যখন 'দম্পতী' হ'ল, তখন তাহাদের স্বভাবও একেবারে বদ্‌লে গেল। অমূল্য নাকি তখন হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অনাবশ্যক আলাপ করিত, এবং তাহার স্ত্রী শ্রীমতী সুভাষিণী এত ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিত যে শৈল (অমূল্যের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সদ্য বিবাহিতা ভগ্নী) বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই নূতন দম্পতীর একটা কথাও বুঝিতে পারে নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রাসায়নিক সংযোগের ফলে মৌলিক বস্তুগুলি আপনাদের স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব একেবারে হারাইয়া ফেলে।

সম্পূর্ণ।